যোগানের সমস্যা। তাই নার্কসের মতে, সমস্ত প্রধান শিল্পে একযোগে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাহলে একের যোগান অপরের চাহিদার দ্বারা নিঃশেষিত হবে। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে নার্কসের যুক্তির ভিত্তি হল Say's Law যার মূলকথা হল "Supply creates its own demand". কিন্তু সমস্ত প্রধান শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে চাই বিপুল পরিমাণ মূলধন। সেই মূলধন কোথা থেকে আসবে ? নার্কসের তত্ত্বে তার উত্তর পাওয়া যায় না। নার্কস বলেছেন, মূলধন কোথা থেকে আসবে সেটি মূলধনের যোগানের প্রশ্ন এবং সেটিকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে নার্কস দেশীয় বাজার প্রসারিত করতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বলেছেন। এর জন্য তিনি সমস্ত প্রধান শিল্পে একসঙ্গে বিনিয়োগ করতে বলেছেন। একযোগে সমস্ত প্রধান শিল্পে বিনিয়োগের দ্বারা উন্নয়নের এই কৌশলকে এক কথায় বলা হয় সুষম উন্নয়ন কৌশল। নার্কস এই সুষম উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম প্রবক্তা। দেখা যাচ্ছে যে, নার্কস সুষম উন্নয়ন কৌশলকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার কৌশল বা শক্তি হিসেবে দেখেছেন।

কিন্তু Hirschman এবং Singer মনে করেন যে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র একটি অনুন্নত দেশের যে অনড়তা নির্দেশ করে তা ভাঙতে হলে **অসম উন্নয়ন কৌশল** গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁদের যুক্তি, বিনিয়োগের জন্য কিছু শিল্পকে নির্বাচন করতে হবে। তাহলে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেশি তৈরি হবে। আবার, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য Rosenstein-Rodan **জোর ধাক্কা** দেওয়ার কথা বলেছেন। আর অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পথে টেনে তুলতে গেলে একটা **একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা** প্রয়োজন বলে Leibenstein মনে করেন।

আবার মূলধনের যোগানের দিক হতেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রটি ভাঙা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি করা। দেশে সমস্ত রকমের অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। তবেই সঞ্চয়ের হার বাড়বে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমেও সঞ্চয়ের অনুপ্রেরণা বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া অনুন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারি সুপ্ত সঞ্চয় হিসাবে বিরাজ করে। যদি এই প্রচ্ছন্ন বেকারদের মূলধন প্রকল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলেও মূলধন গঠনের হার বা সঞ্চয়ের হার বাড়বে। নার্কস এবং লুইস আলাদা আলাদাভাবে এরূপ মূলধন গঠনের কথা বলেছেন।

সবশেষে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সামনাসামনি আঘাত হানা প্রয়োজন। মূলধনের যোগান ও মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির পথে যে সমস্ত বাধা বা অন্তরায় আছে, সেগুলো কার্যকরীভাবে দূর করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা এবং ঐ সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করা।

☐ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির সীমাবদ্ধতা (Limitations)

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির কয়েকটি **সীমাবদ্ধতা** আছে।

প্রথমত, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র অনুন্নতির কারণ হিসাবে মূলধনের অভাবকে দায়ী করেছে। কিন্তু অনুন্নতির পিছনে এটা অন্যতম প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, উদ্যমের অভাব ইত্যাদি কারণেও একটি দেশ অনুন্নত থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, Nurkse দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু Hirschman এবং Singer মনে করেন যে, অনুন্নত দেশের প্রাথমিক অচলতা ও অনড়তা (initial deadlock) কাটাতে গেলে অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, দুষ্টচক্র তত্ত্বের মূল যুক্তিকে (নিম্ন আয়ের জন্যই নিম্ন আয় বা দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ) যদি সত্য বলে ধরা হয়, তাহলে বিশ্বের পূর্বতন কিছু দরিদ্র দেশ বর্তমানে উন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করত না।

চতুর্থত, দুষ্টচক্র তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে, অনুন্নত দেশে সঞ্চয় বলতে বিশেষ কিছু হয় না। আর এজন্যই এই দেশগুলো অনুন্নত। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলে। অনুন্নত দেশেও সঞ্চয়ের পরিমাণ বরাবরই যথেষ্ট বেশি ছিল, অন্তত সঞ্চয় যতটা কম বলে মনে করা হয়, ততটা কম নয়। যেমন, সঞ্চয় যদি না হত, তাহলে

ভারতে তাজমহলের ন্যায় সৌধ এবং আরও অসংখ্য দুর্গ ও মন্দির তৈরি হ'ত না, মিশরে পিরামিড তৈরি হত না। এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, সে যুগেও উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বর্তমানেও অনেক অনুন্নত দেশে সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বেশি। সমস্যা সঞ্চয়ের অপ্রতুলতার নয়, সমস্যা হ'ল সঞ্চয়ের উপযুক্ত ব্যবহারের। রিকার্ডোর মতে, সঞ্চয় সৃষ্টিকারী শ্রেণির নিকট হতে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় নিঃসরণ করতে না পারা এবং তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারাই হ'ল পশ্চাদ্‌গামিতার (backwardness) মূল কারণ।

পঞ্চমত, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে অনুন্নতির কারণ হিসেবে যেগুলো দেখানো হয়েছে তার অনেকগুলিই একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। যেমন, কোন ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা কম বলে সে দরিদ্র। আবার, দরিদ্র বলেই তার সুস্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের দরুন উৎপাদনশীলতা কম। এক্ষেত্রে কম উৎপাদনশীলতা একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। Higgins তাই বলেছেন যে, অনুন্নতির কারণ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে দুষ্টচক্র তত্ত্বে 'Egg and Hen' জাতীয় সমস্যা (অর্থাৎ ডিম আগে না মুরগি আগে ?) রয়েছে।

ষষ্ঠত, Leibenstein মনে করেন যে, দুষ্টচক্র তত্ত্বে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কীভাবে ভাঙা যাবে তার সদুত্তর নেই। দুষ্টচক্র ভাঙতে গেলে সঞ্চয় উৎসাহিত করতে হবে, সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করতে হবে, উপযুক্ত কৌশল ও ক্ষেত্র নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রভৃতি।

সপ্তমত, Nelson মনে করেন যে, স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির একটা বড় কারণ হ'ল জনসংখ্যার চাপ। জনসংখ্যার উচ্চ হারে বৃদ্ধির দরুনই এ সমস্ত দেশে মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান বাড়ছে না। দরিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বে এই জনসংখ্যার সমস্যার উপর কোন আলোকপাত করা হয় নি।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বে নিম্ন আয়ের কারণ হিসাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অপ্রতুলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, অনুন্নতির পিছনে এগুলো অন্যতম প্রধান কারণ। অবশ্য বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তারা কখনোই এক জাতীয় নয়। ফলে অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দেশে দেশে ভিন্ন। তাই অনুন্নতির কারণ হিসাবে কোন 'সাধারণ বিষয়' (common factor) উল্লেখ করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বে অনুন্নতির কারণ হিসাবে মূলধনের অভাবকেই দায়ী করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয় এখানে কিছুটা উপেক্ষিত। সেদিক থেকে বিচার করে এই তত্ত্বটিকে কিছুটা একপেশে (one-sided) বলে অনেকে মনে করেন।

1.5. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ (Obstacles to Economic Development) :

স্বল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলোকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা। এগুলোর জন্যই অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই বাধাগুলো সব দেশের পক্ষে সমান নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে সমস্ত বাধা লক্ষ করা যায় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাধাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ (Polpulation pressure) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধারণত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমরা জানি, মাথাপিছু প্রকৃত আয় ≡ প্রকৃত জাতীয় আয় ÷ মোট জনসংখ্যা। প্রতীকের সাহায্যে লিখতে গেলে, $y \equiv \frac{Y}{P}$. উভয় পক্ষের log নিয়ে পাই, $\log y \equiv \log Y - \log P$. এখন, মনে করি, এই তিনটি চলরাশিই সময়ের (t) অপেক্ষক। উভয়পক্ষকে t-এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই, $\frac{1}{y}\frac{dy}{dt} \equiv \frac{1}{Y}\frac{dY}{dt} - \frac{1}{P}\frac{dP}{dt}$. অর্থাৎ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ≡ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এখন, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয়

আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় কমে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটা সম্ভব হবে না।

2. মূলধনের স্বল্পতা (Lack of capital) ঃ

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা হল মূলধনের অভাব। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে মূলধনের যোগান কম, আবার মূলধনের চাহিদাও কম। মূলধনের চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হতেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। এই দুষ্টচক্র হল এমন কতকগুলো শক্তির একত্র সমাবেশ যারা একে অপরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি অনুন্নত দেশকে অনুন্নতির জালে আবদ্ধ রাখে। এই দুষ্টচক্রের প্রধান কারণ হ'ল মূলধনের স্বল্পতা। এর ফলেই একটি দরিদ্র দেশ দরিদ্রই রয়ে যায়।

3. বাজারের অসম্পূর্ণতা (Market imperfections) ঃ

অনুন্নত দেশে বাজারের নানা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এ সমস্ত দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। বিভিন্ন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে শ্রমিকেরা দেশের এক অংশ হতে অন্য অংশে বা এক পেশা হতে অন্য পেশায় যেতে চায় না। মূলধনও সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। এর ফলে সম্পদের কাম্য ও পূর্ণ ব্যবহার ঘটে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

4. আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ (International forces) ঃ

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মূলধন গমনাগমনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো কাজ করে। এই শক্তিগুলো যেমন একদিকে উন্নত দেশগুলোকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি অনুন্নত দেশগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো নিম্নলিখিতভাবে অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশগুলোকে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী এবং শিল্পদ্রব্য আমদানিকারী দেশ হিসেবে রেখে দিয়েছে।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য হার কৃষিপণ্যের প্রতিকূলে থেকেছে এবং তা অনুন্নত দেশের স্বার্থহানি ঘটিয়েছে।

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশে আন্তর্জাতিক প্রদর্শন প্রভাব সৃষ্টি করেছে। Nurkse মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শন প্রভাব কার্যকর হবার ফলে অনুন্নত দেশগুলোর ভোগ্যব্যয় অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হয়। ফলে এদের সঞ্চয় কমে, মূলধন গঠন কম হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

(ঘ) বিদেশি মূলধন ও বিদেশি কৃৎকৌশলের মাধ্যমে অনুন্নত দেশ থেকে মুনাফা ও রয়াল্টি বাবদ মোটা টাকা বিদেশে চলে যায়। এভাবে অনুন্নত দেশ থেকে সম্পদের নিঃসরণ (drain) ঘটে। উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলো নানাভাবে অনুন্নত দেশে শোষণ চালায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদের নানাভাবে শোষণ করেছিল। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ঘটলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মূলধন হস্তান্তরের মাধ্যমে পরোক্ষ শোষণ বজায় আছে। এ সমস্ত শোষণই অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।

5. উপযুক্ত পরিবেশের অভাব (Lack of suitable environment) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অনুন্নত দেশে প্রায়শই তা থাকে না। তাছাড়া, শিল্পবিপ্লব সার্থক হওয়ার জন্য কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন তা অনুন্নত দেশে নেই। ফলে এই দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

6. কৃৎকৌশলগত বাধা (Technological constraints) ঃ

পাশ্চাত্যের কৃৎকৌশল অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। উন্নত দেশগুলোর কৃৎকৌশল শ্রমসঞ্চয়ী ও মূলধন ব্যবহারকারী। কিন্তু অনুন্নত দেশে অদক্ষ শ্রম উদ্বৃত্ত, অথচ সেখানে মূলধনের অভাব। আবার, এখানে দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব। এরূপ দেশের পক্ষে উপযুক্ত কৃৎকৌশল এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা উন্নত দেশগুলো থেকে অত্যাধুনিক কৃৎকৌশল আমদানি করে। ফলে একদিকে মূলধন

ও দক্ষ শ্রমিকের প্রচণ্ড চাহিদার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে বহু সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক বেকার থেকে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করার অসুবিধা হ'ল অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা।

7. পশ্চাদ্‌গামী প্রভাব (Backwash effect) ঃ

Myrdal-এর মতে, অনুন্নত দেশে সাধারণত একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা বিরাজ করে। এখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ খুবই উন্নত এবং বাকি বৃহৎ অংশ অনুন্নত। এই দুই অংশ পাশাপাশি বিরাজ করে কিন্তু উন্নত অংশ দেশের অনুন্নত অংশকে টেনে উপরে তুলতে পারে না। বরং উন্নত অংশটি অনুন্নত অংশের সম্পদ টেনে নিয়ে নিজে আরো উন্নত হয় এবং অনুন্নত অংশটি ক্রমাগত অনুন্নত হতে থাকে। একেই Myrdal অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাদ্‌গামী প্রভাব (Backwash effect) বলেছেন। এই প্রভাব অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে বলে Myrdal মনে করেন।

8. কৃষি সম্পর্কিত বাধা (Agricultural constraints) ঃ

অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কৃষিই প্রধান কার্য হলেও কৃষিক্ষেত্র তেমন উন্নত নয়। এখানে কৃষি উৎপাদন পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল (gamble in monsoons)। ফলে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল নয়। ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ ঘটে না। এজন্য সমগ্র অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, কৃষকেরা নিরক্ষর, রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী। উন্নত বীজ, সার, কৃষিপদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ফলে কৃষিতে বিশেষায়ণ ঘটে না, শ্রমের চলনশীলতা ব্যাহত হয়। এসবের ফলে অনুন্নত দেশের কৃষিতে উৎপাদনশীলতা খুবই কম। এটিও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে অন্তত উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কৃষি উৎপাদন বাড়াতেই হবে।

9. মানব সম্পদের বাধা (Human resource constraint) ঃ

অনুন্নত দেশের মানব সম্পদও অনুন্নত। এ সমস্ত দেশে জনসংখ্যা খুব বেশি, কিন্তু পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকের অভাব। শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষার মানও উন্নত নয়। ফলে শ্রমের চলনশীলতা খুবই কম। বৃত্তিগত বিশেষায়ণও বড় একটা ঘটে না। এসবের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তথা সমগ্র দেশের প্রসারের হার খুবই কম হয়।

10. অন্যান্য বাধা (Other constraints) ঃ

এই বাধাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল অর্থনৈতিক, কয়েকটি রাজনৈতিক বাধা, আবার কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা। **অর্থনৈতিক অন্যান্য বাধার** মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ (i) ঝুঁকি ও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ও উপযুক্ত মানের ব্যক্তির অভাব, (ii) দক্ষ পরিচালকের অভাব, (iii) কারিগরি জ্ঞান প্রদানকারী সংস্থার অভাব, (iv) উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, (v) উন্নত ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

রাজনৈতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (i) স্থিতিশীল সরকারের অভাব, (ii) জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব, (iii) জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, (iv) অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (i) শিক্ষার অভাব, (ii) জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি কুসংস্কারের উপস্থিতি, (iii) আত্মতৃপ্তির মনোভাব ও ভাগ্যে বিশ্বাস, (iv) কর্মবিমুখতা, (v) ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতি।

এসমস্ত বাধার ফলে অনুন্নত দেশগুলো অনুন্নতই রয়ে যায়। উন্নয়ন ঘটাতে গেলে এসমস্ত বাধা দূর করতে হবে। Rosenstein-Rodan বলেছেন, এজন্য চাই এক বিরাট বা জোর ধাক্কা। Leibenstein বলেছেন Critical minimum effort প্রয়োজন। আর Nurkse এবং Lewis বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রম শিল্পে নিয়োগ করে মূলধন গঠন করা প্রয়োজন।

1.6. অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের আন্তর্জাতিক তুলনা (International Comparisons of Levels of Economic Development):

যে মাপকাঠিতেই পরিমাপ করা হোক না কেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আয়ে তীব্র বৈষম্য দেখা যায়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছে : নিম্ন আয়ের দেশ, মধ্য আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশ। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোকে মোটের উপর অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত (বা উন্নয়নশীল) বা অনগ্রসর দেশ বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে উচ্চ আয়ের দেশগুলোকে উন্নত বা অগ্রসর দেশ বলে বর্ণনা করা হয়। বিশ্বের দেশগুলোর এই শ্রেণিবিভাগ বিশ্ব ব্যাঙ্ক করে থাকে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয়ই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করে আমরা তাদের উন্নয়নের স্তরের একটা তুলনা করতে পারি। নীচের সারণিতে আমরা কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় দেখিয়েছি। এই আয় ডলারের অঙ্কে 2000 সালের। সারণি থেকে আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বা বৈষম্য রয়েছে। শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের ন্যায় দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় খুবই কম (350 মার্কিন ডলার হতে 600 মার্কিন ডলারের মধ্যে)। এরা নিম্ন আয়ের দেশ। আবার, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দেশগুলোর মাথাপিছু আয় খুবই বেশি। আমাদের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, 2000 সালে এদের মাথাপিছু আয় ছিল 24,000 ডলারেরও বেশি। আর এই দুই শ্রেণির মাঝে রয়েছে কিছু দেশ যারা প্রথম শ্রেণির মতো এত দরিদ্র নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণির মতো এতো ধনী নয়। এই শ্রেণিতে রয়েছে ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনার ন্যায় দেশগুলো। বিশ্ব ব্যাঙ্কের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী এরা মাঝারি আয়ের দেশ। 2000 সালে এই দেশগুলোর মাথাপিছু আয় ছিল 3000 ও 10,000 মার্কিন ডলারের মধ্যে। এরা মধ্য-আয়ের দেশ। আমরা আগেই বলেছি, নিম্ন ও মধ্যআয়ের দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়, আর উচ্চ আয়ের দেশগুলোকে উন্নত দেশ বলা হয়।

সারণি

কিছু নির্বাচিত দেশের মাথাপিছু আয় (2000)

ক্রমিক সংখ্যা	দেশ	US ডলারে মাথাপিছু আয় (2000)
1	বাংলাদেশ	380
2	ভারত	460
3	পাকিস্তান	470
4	মালয়েশিয়া	3,380
5	ব্রাজিল	3,570
6	মেক্সিকো	5,080
7	আর্জেন্টিনা	7,040
8	যুক্তরাজ্য (U.K)	24,500
9	ফ্রান্স	24,900
10	জার্মানি	25,050
11	জাপান	34,210
12	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	34,260

সূত্র ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্ক, *World Development Report, 2002*

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন স্তরের এরূপ তুলনা বহুল প্রচলিত হলেও এরূপ তুলনার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় প্রকাশ করা হয় বিভিন্ন মুদ্রার মাধ্যমে।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সরাসরি পরস্পরের তুলনীয় নয়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে তুলনা করতে গেলে ঐসব দেশের জাতীয় আয়কে একই মুদ্রার অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে। সেটি করা হয় কোনো দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়কে ঐ দেশের মুদ্রায় বিশেষ দেশের মুদ্রার মূল্য দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ কোনো দেশের মাথাপিছু আয় ÷ সেই দেশের মুদ্রায় নির্দিষ্ট বিশেষ দেশের মুদ্রার মূল্য। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মাথাপিছু আয় হল 3600 টাকা। এখন, মনে করি, টাকার অঙ্কে ডলারের মূল্য 45 টাকা। তাহলে ডলারের অঙ্কে ভারতের মাথাপিছু আয় $= \frac{3600}{45} = 80$ ডলার। অবশ্য এই পরিমাপেও কিছু ফাঁক থেকে যায়। এই পরিমাপ যথাযথ হত যদি মুদ্রার বিনিময় হারে প্রকৃত দ্রব্যমূল্যের প্রতিফলন ঘটতো। আমাদের উদাহরণে, টাকাকে ডলারে রূপান্তর যথাযথ বলে গণ্য করা যাবে যদি ভারতে 45 টাকার ক্রয়ক্ষমতা আমেরিকায় 1 ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমান হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সাধারণত হয় না। তাই কোনো মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার অঙ্কে প্রকাশ করার মধ্যে কিছু ভুল থেকে যায়। ফলে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনাতেও কিছু ফাঁক থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় বিভিন্ন দেশ আয়ের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় সেবাকার্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। আবার অন্য কিছু দেশে জাতীয় আয় গণনার সময় সেবাকার্যের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বভাবতই, ঐ দু'ধরনের দেশের জাতীয় আয় সরাসরি পরস্পরের তুলনীয় নয়। **তৃতীয়ত,** অনুন্নত দেশে মোট উৎপন্নের একটা বড় অংশ বাজারে বিক্রির জন্য আসে না। ঐ সমস্ত দ্রব্যের যদি কোনো মূল্য না ধরা হয়, তাহলে ঐ সকল দেশের জাতীয় আয়ের মান প্রকৃত জাতীয় আয় অপেক্ষা কম হবে। **চতুর্থত,** আর্থিক জাতীয় আয় হতে প্রকৃত জাতীয় আয় পেতে গেলে আর্থিক জাতীয় আয়কে দাম সূচক দ্বারা ভাগ করতে হয়। তাহলে এই দাম সূচকের নির্বাচনের উপরও প্রকৃত জাতীয় আয়ের মান নির্ভর করবে। কোন্ বছরের দামসূচক গ্রহণ করা হবে তার কোনো বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম নেই। সুতরাং, দাম সূচকের নির্বাচন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয় আয়ের মান ভিন্ন হবে।

এ সমস্ত কারণে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের কোন অর্থবহ তুলনা খুবই জটিল বিষয়। কিন্তু বিকল্প কোন অপেক্ষাকৃত ভাল পদ্ধতি না থাকায় মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের তুলনা করার রীতি চলে আসছে।

1.7. অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Economic Growth and Economic Development):

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে পার্থক্য করতে চান। তাঁদের মতে, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুটি ভিন্ন ধারণা। অর্থনৈতিক প্রসার হল মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে দেশের আর্থিক কাঠামোয় পরিবর্তন। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনের পরিবর্তন। প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে অর্জিত আয়ের অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রের আয়ের অনুপাত বাড়তে থাকে। তেমনি, জনসাধারণের জীবিকার কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে। এসমস্ত পরিবর্তন না ঘটলে তাকে বলা হবে অর্থনৈতিক প্রসার। আর জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে এই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যেমন, Kindleberger-এর মতে, অর্থনৈতিক প্রসারের অর্থ হল বর্ধিত উৎপাদন, আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হল বর্ধিত উৎপাদনের পাশাপাশি ঐ উৎপাদনের কলাকৌশল ও বণ্টনের পরিবর্তন।

অবশ্য Lewis অর্থনৈতিক প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথা দু'টি একই অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁর "The Theory of Economic Growth" বইয়ে তিনি বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝাতে

আমরা 'Growth' কথাটি ব্যবহার করবো ; তবে **বৈচিত্র্যের জন্য কিংবা একঘেয়েমি কাটাতে** মাঝে মাঝে 'Progress' অথবা 'Development' কথাটি ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু Friedman মনে করেন যে, অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথা দুটির তাৎপর্য আলাদা। তাঁর মতে, প্রসার হল কোন কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াই অর্থনীতির এক বা একাধিক দিকে বিস্তার। কিন্তু উন্নয়ন হ'ল, তাঁর কথায়, একটি উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া যার ফলে সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপান্তর ঘটে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল ব্যাপকতর শব্দ। অর্থনৈতিক প্রসার হল মাথাপিছু উৎপন্নের পরিমাণগত পরিবর্তন। এরই পাশাপাশি ঘটে শ্রমশক্তি, ভোগ, মূলধন ও বাণিজ্যের বিস্তার। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু এই সকল পরিমাণগত পরিবর্তনকেই বোঝায় না, এরই সাথে মানুষের অভাব, অনুপ্রেরণা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক রীতিনীতির গুণগত পরিবর্তনকেও বোঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে প্রসার ও সঙ্কোচন (decline) উভয়কেই বোঝায়। কোনো অর্থনীতিতে প্রসার ঘটছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না তাও হতে পারে। কেননা এমন হতে পারে যে, অর্থনৈতিক প্রসারের সাথে সাথে উপযুক্ত কাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন না ঘটার ফলে দারিদ্র্য, বেকারি ও অসাম্য বাড়ছে। সুতরাং কোন দেশে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না এমনটা হতেই পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা অধ্যাপক Clower কর্তৃক লাইবেরিয়ার অর্থনীতির সমীক্ষা উল্লেখ করতে পারি। Clower এই সমীক্ষার ফলাফলের যে শিরোনাম দিয়েছিলেন তা খুবই অর্থবহ। শিরোনামটি হল ঃ উন্নয়নহীন প্রসার (Growth without Development)। উন্নয়ন ছাড়াই প্রসার ঘটতে পারে। তবে এর উল্টোটি সত্য নয়। কেননা প্রসার ছাড়া উন্নয়ন ঘটতে পারে না।

উপসংহারে বলতে পারি, অর্থনৈতিক প্রসার বলতে বোঝায় প্রকৃত আয়ে বৃদ্ধি। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমরা শুধু এই আয়বৃদ্ধির সূচককেই বুঝি না, পাশাপাশি অন্যান্য সূচক, যেমন, আয়ের বণ্টন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, আবাসন, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সূচকের কাম্য দিকে পরিবর্তন বুঝি। অর্থনৈতিক প্রসারের অর্থ হল উৎপাদনের বৃদ্ধি, আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হল অর্থনৈতিক প্রসার ও পরিবর্তন (Growth plus change)। এই পরিবর্তন দেশের সামগ্রিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে এমন যে কোনো পরিবর্তন হতে পারে। তবে এর মধ্যে দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই, অর্থনৈতিক প্রসার কথাটি স্বল্পকালে প্রযোজ্য, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া কেননা কোনো দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন দীর্ঘকালেই সম্ভব। আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে অর্থনৈতিক প্রসার অবশ্যই ঘটবে কিন্তু অর্থনৈতিক প্রসার ঘটলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে এই সীমারেখা টানেন না। আমাদের আলোচনায়ও আমরা এই দুটি ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য করছি না। আমরা এই দুটিকে সমার্থক বলে ধরছি। অর্থনৈতিক প্রসার ছাড়া যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক প্রসারের কোন মূল্য নেই। সুতরাং, এই দুটি ধারণা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারকে আমরা সমার্থক হিসেবেই দেখছি। যখন অর্থনৈতিক প্রসার ঘটছে তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। আর যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে, তখন অর্থনৈতিক প্রসার তো ঘটছেই কেননা অর্থনৈতিক প্রসার ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

1.8. উন্নয়ন অর্থনীতির বিকল্প তত্ত্বসমূহ (Alternative Approaches to Development Economics) :

উন্নয়নমূলক অর্থনীতির আলোচনায় মূলত দুটি ধারা বা দুটি দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ঃ চিরাচরিত বা নয়া-প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

1. চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি বা চিরাচরিত তত্ত্ব (Traditional or Neoclassical Approach):

চিরাচরিত তত্ত্বে বলা হয় যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের স্তরের তারতম্যের প্রধান কারণ হল তাদের

প্রাকৃতিক সম্পদের তারতম্য। এ ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে Nurkse-এর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, Nelson-এর নিম্ন আয়ের ভারসাম্য ফাঁদ, Leibenstein-এর একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টার তত্ত্ব, Myrdal-এর ক্রমপুঞ্জিত কার্যকারণ তত্ত্ব প্রভৃতি।

2. মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Marxian Approach) ঃ

মার্ক্সীয় তত্ত্বে বা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, অনুন্নতি ও উন্নতি পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়নের পূর্বে পৃথিবীতে কোন অনুন্নতি ছিল না। উন্নয়নের ন্যায় অনুন্নতিও একটি প্রক্রিয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলস্বরূপ উন্নতি ও অনুন্নতির উন্মেষ ঘটেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলো আসলে উন্নত দেশগুলোর ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যই অনুন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন Baran, Frank, Kay, Immanuel এবং আরও অনেকে।

আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বগুলোকে অনেকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (i) ফাঁদ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (Trap Theories), (ii) প্রাচীন তত্ত্বসমূহ (Classical Theories) এবং (iii) মার্ক্সীয় তত্ত্বসমূহ (Marxian Theories)

(i) ফাঁদ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (Trap Theories) ঃ

এই ধরনের তত্ত্বের আওতায় সেই তত্ত্বগুলোকে রাখা হচ্ছে যেগুলো মূলত ম্যালথুসীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানো। এই ধরনের তত্ত্বের প্রবক্তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি জোর ধাক্কা বা একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টার কথা বলেন। Rodan-এর জোর ধাক্কার তত্ত্ব, Leibenstein-এর একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টার তত্ত্ব এবং Nelson-এর নিম্ন আয়স্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ তত্ত্ব এই শ্রেণির উন্নয়ন তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, উন্নয়ন তত্ত্বসমূহের এই ধরনের শ্রেণিবিভাগের সমর্থকদের মতে, সুষম ও অসম উন্নয়ন তত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্য এবং Rostow-র উত্তোলন তত্ত্বও (Take off theory) এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই সকল তত্ত্বের প্রবক্তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলত জোর ধাক্কার বা একযোগে বৃহৎ পরিমাণ বিনিয়োগের কথা বলেছেন, যদিও এই জোর ধাক্কার ধারণা এবং তার যৌক্তিকতা সবার তত্ত্বে একরকম নয়। কিন্তু এসকল তত্ত্বগুলো নির্দেশ করে যে, যদি কোন দেশ পর্যাপ্ত আকারের বড় পরিমাণ বিনিয়োগ একযোগে বা এক লপ্তে করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই দেশ অনুন্নতই থেকে যায়। সেই দেশ অনুন্নতির শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।

(ii) প্রাচীন তত্ত্বসমূহ (Classical Theories) ঃ

এই শ্রেণিতে সেই সমস্ত তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলো উদ্বৃত্ত আহরণের প্রক্রিয়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় প্রসারের মধ্যে সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচনা করে। রিকার্ডোর উন্নয়ন মডেল, লুইসের অসীম শ্রমের যোগানের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল এবং নার্কসের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও সুপ্ত সঞ্চয়ের মডেল এই প্রাচীন তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(iii) মার্ক্সীয় তত্ত্বসমূহ (Marxian Theories) ঃ

আমরা আগেই বলেছি যে, এই তত্ত্বে অনুন্নতির কারণ হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের প্রসারকেই দায়ী করা হয়। এই তত্ত্বের মূলকথা হল যে, উপনিবেশকারীরা তাদের উপনিবেশগুলোকে শোষণ করে, তাদের কাঁচামাল সস্তায় আত্মসাৎ করে এবং পুনরায় ঐ উপনিবেশে শিল্পজাত দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবে তারা উপনিবেশগুলোর সম্পদ আহরণ করেছে, উপনিবেশগুলোকে তাদের নিজস্ব সম্পদ হতে বঞ্চিত করেছে এবং সেই সম্পদের দ্বারা তারা নিজেরা উন্নত হয়েছে। সুতরাং উপনিবেশবাদই হল একাধারে উন্নতি ও অনুন্নতির ফল।